Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 24-29
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

মনুষ্যত্বের ধারণা : রবীন্দ্রদর্শনের আঙ্গিকে একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

ড. সুজিত কুমার মণ্ডল
সহকারি অধ্যাপক,দর্শন বিভাগ, বোলপুর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Rabindranath Tagore was a profound thinker . he firmly believed that religion is a constitutional necessity of man . he was opposed to all kinds of instititutional religion . Main objective which I wanted to show that how Rabindranath concidard manusatta or manabdharma as a prime Religion of man .It is not like that Hindu or Muslim, it's a wider aspect of human being. All kinds of instititutional religion is religion but not Religion of Man . The Religion of Man is Manusatta or Humanity . Rabindranath observes that in so far humanity is concerned, Dharma signifies the essential nature of man, In this short discourse, I would like to highlight Rabindranath's philosophical realization towards the manusatta or manabdharma .

মানুষের সাধারণ ধর্ম হল মনুষ্যত্ব । এই ধর্মের জন্য এক শ্রেণীর প্রাণীকে আমরা মানুষ বলে গন্য করি । এই মনুষ্যত্ব ধর্ম অন্যান্য সকল প্রকার প্রাণীর থেকে মানুষকে আলাদা করে রাখে । প্রশ্ন উঠতে পারে এই মনুষ্যত্ব ধর্মটির স্বরুপ কী ? দার্শনিকগণ এ বিষয়ে নানা তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন । রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় আমরা 'মনুষ্যত্ব বলতে বুঝি সৃজনশীলতা । সৃজনশীলতাকে তিনি 'ধর্ম' বলে উল্লেখ করেছেন ।রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'ধর্ম' বলতে প্রাতিষ্ঠানিক 'ধর্মে'র কথা বলেননি । রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম কোন আচার-অনুষ্ঠান নয়, রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' বলতে মানুষের মনুষ্যত্বকেই নির্দেশ করেছেন ।এই প্রবন্ধে মূলত মনুষ্যত্ব ধর্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত আলোচিত হবে ।

এই মনুষ্যত্ব হলো মানুষের মধ্যে অর্ন্তনিহিত শক্তি । অতএব মনুষ্যত্ব স্বীকার করাই হল মানুষের ধর্মসাধনা । মানুষের দুটি দিক লক্ষ করা যায় । একটা আত্মগত এবং অপরটা ভূমাগত । ভূমাগত দিকের স্বাভাবটাই মানুষের কাছে আসল সত্য । এই প্রসঙ্গে একটি রবীন্দ্রনাথ একটি কথিত বাণী উদ্ধৃত করেছেন-

" শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু হীয়তেহ'র্থদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে ।

মানুষের স্বাভাবে শ্রেয়ও আছে, প্রেয়ও আছে । ধীর ব্যক্তি দুইকে পৃথক করেন । যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি সাধু, যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি পুরুষার্থ থেকে হীন হন ।" মানুষের স্বাভাব পূর্ণতা পায় শ্রেয় ও প্রেয়কে নিয়েই । প্রিয়বোধকে মানুষ প্রবৃত্তির দ্বারা গ্রহণ করে । এরপর প্রেয়কে মানুষ শ্রেয়ের সঙ্গে যোগ করে । প্রকৃতিগত স্বাভাবের উপরে মানুষ নিজের আত্মিক স্বাভাবকে মর্যাদা দিয়ে মানুষ নিজের মধ্যে সর্বকালীন মনুষ্যধর্মকে উপলব্ধি করে । মানুষ ব্যক্তিগত সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করে বিশ্বগত কর্মের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে। মানুষ হয়ে উঠবে বিশ্বকর্মা। বিশ্বগত আত্মার মাধ্যমে সে হয়ে উঠবে মহাত্মা। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন- " ব্যক্তিগত স্বার্থও জড়প্রথাগত অভ্যাস কাটিয়ে যাবে তার প্রয়াস, তবেই বিশ্বগত

কর্মের দ্বারা সে হবে বিশ্বকর্মা। অহংকারকে ভোগশক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তার মানুষ হবে মহাত্মা । মানুষের একটা স্বাভাবে আবরণ, অন্য স্বভাবে মুক্তি ।"

বেদে ঈশ্বরকে আবিঃ-প্রকাশস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে ,তিনি আপন মহৎ কীর্তিতেই সত্য । মানুষের স্বভাব সেইরূপত্মাকে প্রকাশ । জৈবিক ও ঈশ্বর্যের দিক দিয়ে মানুসের প্রকাশ, অহংযোগ্য হীনতার প্রকাশ । এখানে প্রাণী জগতের পশুদের সঙ্গে মানুষের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় ।মানুষ সেখানে সত্য, ভূমাকে প্রকাশ করে সেখানে সে পশুকুল থেকে আলাদা বাহ্যিক বিষয়সমূহ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে । মানুষ সবরকম সীমাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে ।

একজন গায়কের গান সার্থক হয় সমগ্রহ দ্বারা, গান বিস্তারের সংখ্যা দ্বারা সার্থক হয় না । একজন শ্রেষ্ট গায়কের সকল গান সেখানেই অপরিমেয়, যেখানে সুর , তাল, ছন্দ সামঞ্জস্য থাকে । তেমনি মানুষও প্রতিনিয়ত তার অহং এর গণ্ডি ছাড়িয়ে আত্মার দিকে, অসীমের দিকে এগোচ্ছে । সৌন্দর্য, কল্যাণ, ত্যাগের মধ্যমে স্বার্থগত মানুষকে অতিক্রম করে মানুষ প্রকাশ করে তার আত্মাকে ।

মানুষ স্বাভাবটিকে জানার চেষ্টা করে । কারণ এই স্বভাব শুধুমাত্র জীবর্ধম নয়, নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া সত্যের আভাসন । এই সত্যকে আয়ও করার জন্য অনুশীলনের দরকার ।রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, " প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়ের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবে বর্তমান, আবার যা ইচ্ছা করা উচিত সেই শ্রেয়ের ইচ্ছাও মানুষের স্বভাব । শ্রেয়কে গ্রহণ করবার দ্বারা মানুষ কিছু একটা পায় যে তা নয়, কিছু একটা হয় ।" এই 'হয়' জিনিসটাই হলো তার মনুষ্যত্বে উত্তরণ । নিজের পছন্দমতো কোন কর্মে লিপ্ত হওয়া মানেই মহৎ কাজ এমন নয় । যে কর্মে সকল মানুষের মঙ্গলসাধন হয়, সেই কর্মই আসল কর্ম জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ মানুষের চিরকালের । জ্ঞান ও কর্মের ভিতর দিয়ে নিজস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মানুষ খুঁজে পায় তার মনের মানুষকে । এই মনের মানুষই হলো পরম শ্রেয়ের আদর্শ এবং সকল ঐশ্বর্যের আধাররূপে ঈশ্বর । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। " মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা । ব্যাক্তিগত সংস্কার ছাড়িয়ে যাবে তার জিজ্ঞাসা, তবেই বিশ্বগত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে মানুষের বিজ্ঞান ।"

প্রয়োজনের যে সীমা সেটাকে ছাড়িয়ে যাওয়াই হল মানুষের প্রাণৈশ্বর্য্যের পরিচয়। ছাপিয়ে যাওয়া অংশই আনন্দ, স্বাস্থ্য ও শক্তির বিকশিত সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যকে মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন " মানুষ আপন মানবিকতারই মহাত্ম্যবোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌচেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না।" তিনি আরও বলেন যে " আমরা সত্তামাত্রকে যে ভাবে যেখানেই স্বীকার করি সেটা মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। " পরমাত্মার উপলব্ধি সকলের আত্মার সার্বিক উপলব্ধির যোগফল। সেইজন্য পরমাত্মার অন্তরেই আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুলির আভাস । আমরা বাস্তব জগতকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করি এবং পরাত্মাকে আমরা প্রেমময় অনুভবের দ্বারা জানতে পারি। আমরা পিতা মাতার সূত্র ধরে জীবনে প্রথম প্রেমের আস্বাদ পায়, তারপর ধীরে ধীরে প্রেমের দীক্ষা মানুষকে পরমসত্তার উপলব্ধিতে উপনীত করে । কারণ বাস্তব জীবনের সকল প্রেমের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে তাঁরই প্রেমের মহিমা ।এই পরমাত্মার কর্মস্থান নির্নয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত বিশ্বাসের কথা বলেননি । তিনি বলেছেন " সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, বিশেষ কোনো দেশকালে বদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষ কোনো মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানবের ভূতভবিষ্যৎকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানবলোকে।" অর্থাৎ ইনি কোন অবতার নন, ইনি কোন মহাপুরুষ নন, ইনি হলেন মানুষের অন্তরের পুরুষ, ইনি সকল মানুষের মধ্যেই বিরাজ করেন। ইনি আমাদের সকলকে পথে বের করেছেন চিরতরে । যদিও সে পথ বড় কঠিন বড় দুঃখের তবুও এগিয়ে চলেছে পূর্ণতার দিকে। তিনি বলেছেন এই পথ চলা "অসত্যের থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে , মৃত্যুর থেকে অমৃতের দিকে, দুঃখের মধ্য দিয়ে, তপস্যার মধ্য দিয়ে ।" এই পথ হলো চিরকালের, চিরদিনের, এই পথ চলার মধ্যে দিয়েই মানুষের ধর্মাচরণ। মানুষের জীবনে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে মানুষ পথ বেয়ে এগিয়ে যায়, কিন্তু পথে নানা বাধা পথকে খন্ডিত করার চেষ্টা করে , তবুও মানুষ এই বাধাকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে চলে, অতীত অভিজ্ঞতা আমাদের নিকট বষয়ের একটি সর্বজনীন রুপ উপস্থাপিত করে। এই রুপ সার্বক্ষণিক হয় না। ফলে অর্থ, বুদ্ধি, বিজ্ঞান মানুষের ধর্মকে রক্ষা করতে পারে না। নানা আঘাত এসে লাগে মানবধর্মের উপর। আমরা রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থের কবিতাগুলিতে কথা উল্লেখ করতে পারি। কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কিভাবে মানব ধর্মের উপর আঘাত বয়ে আসছে।

চিরপথিক মানুষের যাত্রাপথে আলো-আঁধারি খেলা চলতেই থাকে সারাজীবন ধরে, এ যেন শেষ হবার নয় । তবু পথের যে বাধা সেটা সত্য । সকল বাধা অতিক্রম করেও প্রেমের তীর্থে পৌছানোটাও সত্য। ভ্রান্ত বিশ্বাস হচ্ছে যাত্রাপথের হানাহানির মূল কারণ। আমরা অনেক সময় নিজেদের মতটিকে চূড়ান্ত বলে ধরে নিই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন " নিত্য আদর্শকে শ্রদ্ধা করি বলেই ধর্মমতকেও নিত্য বলে স্বীকার করতে হবে এমন কথা বলা চলে না।" একমাত্র মানুষই প্রয়োজনে মতের বদল ঘটাতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এখানে একটা তুলনা টেনেছেন- বৈজ্ঞানিক মত সর্বদা পরীক্ষাসাপেক্ষ হয় বলে এখন আর কেউ বলেন না যে সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, তেমনি মানুষের আচরণের বিধিও পরীক্ষাসাপেক্ষ ।নিত্য আদর্শের সঙ্গে তাকে গোলানো ঠিক হবে না । মানুষ প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট মতের পুন্ররবিচার করে, যদি এটা না করা হয় তাহলে সাম্প্রদায়িক বরোধ দেখা দেয়।"

সমগ্রের উপলব্ধি পথে এই সংকীর্ণ ক্ষুদ্রতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অসীমচেতনা জাগ্রত থাকলে সম্প্রদায় চেতনা সেই বিরাটের মধ্যে সমন্বিত করে নেওয়া সম্ভব। শুধু সম্প্রদায় চেতনা নয়, ব্যক্তিচেতনাও বৃহৎসত্তায় মিলিত হয় বলেই মানুষ অবিচ্ছেদ্য পূর্ণতা পেলেও তাতে পরাভব নেই কারণ, আমাদের সাধনা সর্বমানবের সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -" আপন সত্তার পরিচয়ে মানুষের ভাষায় দুটি নাম আছে । একটি অহৎ, আর একটি আত্মা । প্রদীপের সঙ্গে একটিকে সঙ্গে আকটিকে তুলনা করা যায়, আর একটিকে শিখার সঙ্গে । প্রদীপ আপনার তেল সংগ্রহ করে । আপনার উপাদান নিয়ে প্রদীপের বাজার দর, কোনটার দর সোনার, কোনটার মাটির । শিখা আপনাকেই প্রকাশ করে,। এবং তারই প্রকাশে আর - সমস্তই প্রকাশিত । প্রদীপের সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সে প্রবেশ করে নিখিলের মধ্যে ।" ব্যক্তিরূপী প্রদীপের আধার অনলম্বন করেই আত্মারূপী শিখা সকলকে আলোকিত করলেও জগতের ব্যাপারে সেই আলোর পাশে ছোট।

স্বভাব্ধর্ম যখন সত্তা বা আত্মার নিগ্রহের কারণ হয় । তখন আচরণবিধির পুণ্যে মঙ্গল অর্জন সম্ভব নয় । স্বভাবধর্ম অনুযায়ী স্বভাবিক প্রবৃত্তি হল শত্রুহনন, কিন্তু মানুষ বলে " শত্রুকে ক্ষমা করো ।' " শত্রুকে ক্ষমা করা জীবধর্মের জন্য হানিকর হলেও মানবধর্মের পক্ষে উৎকর্ষ লক্ষণ ।" মানুষের এই স্বভাবে মহত্ত্বের প্রকাশ ঘটে । মহত্ত্বই হচ্ছে মানুষের আসল ধর্ম । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সত্যের ধর্ম বলতে বোঝায় মানুষের মধ্যে যে সত্য তাঁরই ধর্ম , মানুষের মধ্যে যে মহৎ তাঁরই ধর্ম। যুদ্ধ করতে গিয়ে মানুষ যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে ছোটো দিকে তার জিত হলেও বড়ো দিক থেকে তার হার। উপকরণের দিকে তার সিদ্ধি, অমৃতের দিকে সে বঞ্চিত।"

মানুষের ধর্মের এই উৎকর্ষ লক্ষণ বৌদ্ধধর্মে পরম অভিব্যক্তি লাভ করেছে। 'ধম্মপদে' বলা হয়েছে যুদ্ধে জয়ীর থেকে আত্মাজয়ীই শেষ্ট।

" যো সহস্স্নং সহস্সেন সঙ্গামে মানুষে জিনে।
একঞ্চ জেয্যমত্তানাং স বে সঙ্গামজুত্তমো।"

যুদ্ধে শত শত মানুষকে যিনি জয় করেন তিনিই হলেন শেষ্ট। বৌদ্ধধর্মে আত্মাসুখাভিলষিদের প্রতি সাবধান বাণী লক্ষ করা যায় -

"সুখ কামানি ভূতানি যো দন্ডেন বিহিংসতি।
অওনো সুখমেসানো পেচ্চ সোন লভতে সুখং।
সুখকামনি ভূতানি যো দন্ড হিংসতি,
অওনো সুখমেসানো পেচ্চ সো লভতে সুখং ।"

অর্থাৎ আত্মাসুখাভিলাষি হয়ে ব্যক্তি সুখ প্রত্যাশী জীবকে দন্ড দিয়ে হিংসার আশ্রয় নেয়, সে পরলোকে কোন সুখ লাভ করে না, আর যে ব্যক্তি আত্মসুখাভিলষি হয়ে সুখ প্রত্যাশী জীবকে দন্ড দ্বারা হিংসার আশ্রয় নেন না তিনি পরলোকে সুখ লাভ করেন।

একজন ধার্মিক যিনি ধর্মের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান মেনে চলেন, তিনিও কেমন করে পাপের পথে এগিয়ে যান তার উদাহরণ আমরা দেখেছি 'বিসর্জন' কাব্যনাট্যে । সদাচারী ভক্তিমান জয়সিংহের স্রষ্টা রঘুপতি কিছুতেই অধর্মচারী হতে পারেন না , অথচ তিনি বলিপ্রথা বন্ধ করার আদেশের বিরোধিতা করতে গিয়ে অন্ধ হয়ে পড়েছেন। অন্যদিকে প্রেমে ঐকান্তিকভাবে ভক্তিমান জয়সিংহ গুরুর আদেশকে অলঙ্ঘনীয় বলে মেনেও আত্মাবিসর্জনের পথে চৈতন্য ফিরিয়ে দিয়েছে গুরুকে, তখনই

প্রেমধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মৃত্যুই জয়সিংহের এবং তার আদর্শকে নতুন জীবন দান করেছে। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদনের জন্য সমাহৃত ফুল উৎসর্গিত হয়েছে মানবযাত্রী জয়সিংহের চরণে। এখানে আমরা দেখলাম প্রথাধর্মের সঙ্গে যুদ্ধে মানুষের ধর্ম জয়লাভ করেছে, জয় হয়েছে মানবের, জয় হয়েছে পরমমানবের।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন " 'হয়' এবং হওয়া উচিত এই দ্বন্দ্ব মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকেই প্রবলবেগে চলছে, তার কারণ বিচার করতে গিয়ে বলেছি- মানুষের অন্তরে এক দিকে পরমমানব আর -এক দিকে স্বার্থসীমাবদ্ধ জীবমানব, এই উভয়ের সামঞ্জস্যচেষ্টাই মানব-মনের নানা অবস্থা-অনুসারে নানা আকারে প্রকারে ধর্মতন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত।"

মানুষের কল্যাণ কমনা সকল মানুষের দ্বারা হয় না । পরমমানব মনের দ্বারা এই ধরনের চিন্তা সম্ভব । এখানে যা 'হয়' এর ভতর যা ' হওয়া উচিত' এর কোন জায়গা নেই । 'হওয়া উচিত' হল পরমমানবের বিষয় আর 'হয়' হচ্ছে জীবমানবের বিষয় । যা 'হয়' তাই নিয়ে সংসার করতে বসেছিলেন বিসর্জনের রঘুপতি এবং ' হওয়া উচিত' তার দিক নির্দেশ করতে বসেছিলেন জয়সিংহ । জয়সিংহ ব্যক্তিসীমার উপরে উঠে মানব সভ্যতাকে উদ্ভাসিত করার চেষ্টা করেছিলেন ।জয়সিংহের মতো রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ স্বীকারের কথা স্মরণ করেছেন । তিনি বলেছেন- " মানুষ অশ্রান্ত যাত্রা করছে অন্নবস্ত্রের জন্য নয়, আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে মানবলোকে মহামানবের প্রতিষ্টা করবার জন্যে, আপনার জটিল বাধার থেকে আপনার অন্তরতম সত্যকে উদ্ধার করবার জন্যে; সেই সিত্য যা তার পুঞ্জিত দ্রব্যভারের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত কৃতকর্মের চেয়ে বড়ো, তার সমস্ত প্রথা মত বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো, যার মৃত্যু নেই, যার ক্ষয় নেই ।"

ঈশ্বরের গুণাবলী নিজ অন্তরে সন্ধান করাই হলো সত্যিকারের ঈশ্বর সাধনা এই কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে বার বার বলার চেষ্টা করেছেন । অহংকারকে মন থেকে মুছে ফেলে মানুষ ভূমাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- "ভূমা-আহারে বিহারে আচারে বিচারে ভোগে নৈবদ্যে মন্ত্রে তন্ত্রে নয় । ভূমা-বিশুদ্ধ জ্ঞানে, বিশুদ্ধ প্রেমে, বিশুদ্ধ কর্মে । বাইরে দেবতাকে রেখে স্তরে অনুষ্ঠানে পূজোপচারে শাস্ত্রপাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ, কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সব চেয়ে কঠিন সাধনা।"

মন থেকে অহংকার দূর করতে পারলেই পরমমানবের কাছে পৌঁছানো সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-" মানুষ আপন ব্যক্তিগত সংস্কারকে পার হয়ে যে জ্ঞানকে পায়, যাকে বলে বিজ্ঞান, সেই জ্ঞান নিখিল মানবের, তাকে সকল মানুষই স্বীকার করবে, সেই জন্য তা শ্রদ্ধেয় । তেমনি মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি সেই-আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম । একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি । আবার বাউলরা বলে -
মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ ।.....
একবার দিবাচক্ষ্যু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বঠাই ।
সেই মনের মানুষ সকল মনের মানুষ, আপন মনের মাঝে তাঁকে দেখতে পেলে সকলের মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

এখানে বাউলদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ রামানন্দের কর্মের মিল লক্ষ করা যায়। মিল লক্ষ করা যায় গৌতমবুদ্ধের উপদেশের, আবার যীশুখ্রিষ্টের উক্তির মিল লক্ষ করা যায়। রামানন্দ একদিন নাভা চন্ডালকে, মুসলমান জোলা কবীরকে, রবিদাস চামারকে আলিঙ্গণ করে আপন বেড়াকে অতিক্রম করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের ভর্ৎসনার মাঝে তিনি বলতে পেরেছিলেন "সোহহম্'। এই সত্যের বলে তিনি পেরিয়ে গেছিলেন ক্ষুদ্র সংস্কারজাত ঘৃণাকে। এই ঘৃণ্য সংসারই মানুষের মধ্যে ভেদ ঘটিয়ে সমাজকে আঘাত করে। যিশুখ্রিষ্ট বলেছিলেন 'সোহহম্' অর্থাৎ আমি এবং আমার পরমপিতা একই । তিনি পৃথিবীর সকল মানুষকে সমানভাবে ভালোবেসে ছিলেন। তিনি অহং সীমা অতিক্রম করে পরমমানবের সঙ্গে নিজেকে অভেদ ভাবতেন। গৌতমবুদ্ধ হিংসা, শত্রুতা ত্যাগ করে জগতের প্রতি মৈত্রী স্থাপন করার কথা বলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভাষায় বলা যায়-আপন জীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে কর্মের মাধ্যমে । অসীম সত্যকে বাস্তব সত্যে রূপান্তরিত করতে হবে, একমাত্র মহিমান্বিত মানুষই পারে সেই কর্মের পরিচয় দিতে । তিনি আরও বলেছেন ' " কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করেছে তুচ্ছ, দুঃখকে করেছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করেছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল । তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই । আছে তার মহিমা ।সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই কেবল মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোহহম্ । সেই অধিকার জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল মানুষেরই। তিনি ক্ষিতিমোহন সেনের বাউলের সেই বিখ্যাত বাণী উচ্চারণ করেছেন-

জীবে জীবে চাহিয়া দেখি সবই যে তার অবতার,
ও তুই নূতন লীলা কী দেখাবি যার নিত্যলীলা চমৎকার ।

প্রতিদিনই মানব-সমাজে এই অসংখ্য মানুষ জ্ঞানে-প্রেমে ত্যাগে নানা আকারেই অপরিমেয়কে প্রকাশ করছে" ।

মানুষ অপরিমেয়কে প্রকাশ করবার সাধনায় সর্বদা মগ্ন, এর থেকে মানুষের মুক্তি নেই । মুক্তি, স্বর্গ,শান্তি ইত্যাদির জন্য মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় গিয়ে উপাসনা করার দরকার নেই । তিনি বলতেন কর্মের মধ্যে দিয়েই মানুষকে মুক্তি খুঁজতে হবে, এই যে চলামানতার ধর্ম এটাকেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন । তাঁর ধর্ম মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় দিয়ে উপাসনা করার ধর্ম নয় । রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্রাত্য ও মন্ত্রহীন ছিলেন । তিনি বলেছেন-

"শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে,
পরেছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে,
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব বলে.....
কেননা, আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন ।
মন্দিরের রুদ্ধদ্বারে এসে আমার পূজা
বেরিয়ে চলে গেল দিগন্তের দিকে-
সকল বেড়ার বাইরে,
লক্ষত্রখচিত আকাশতলে,
পুষ্পখচিত বনস্থলিতে,
দোসার-জনার মিলন-বিরহের
বেদনা বন্ধুর পথে ।....
আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য আলোকের প্রকাশ
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত ।
আমি ব্রাত্য আমি মন্ত্রহীন "

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় স্বভাব-ধর্ম বলতে রবীন্দ্রনাথ আচার ক্রিয়া-বর্হিভূত মনুষ্যত্ব বোধকেই বুঝেছেন, অর্থাৎ বিশেষ প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিদীর্ণ অতীন্দ্রিয় সংস্কারকে ধর্ম বলে স্বীকার করেন নি । এই ধর্মের মূল লক্ষ্য মনুষ্যত্ব বোধের জাগরণ । এই জাগরণ সবরকমের সংকীর্ণতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে ।

পাদটীকাঃ-

১। মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা-৬২৯ ।
২। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩০ ।
৩। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৩০ ।
৪। ঐ, পৃষ্ঠা -৬২৯ ।
৫। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৩০ ।
৬। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৩৩ ।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৩৩-৩৪ ।
৮। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩৪ ।
৯। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩৪ ।
১০। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩৭ ।
১১। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩৭ ।
১২। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩৮ ।
১৩। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩৯ ।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩৯ ।
১৫। ধম্মপদ, শ্লোক সংখ্যা - ১০৩ ।
১৬। ঐ ,শ্লোক সংখ্যা—১৩১-৩২ ।
১৭। রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম, সনজীদা খাতুন, বাংলা একাডেমীর নিবেদন **:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃষ্ঠা - ২৫৯ ।
১৮। মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা -৬৪০ ।
১৯। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৪১ ।
২০। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৪৩ ।
২১। ঐ, পৃষ্ঠা -৬৪৩ ।
২২। ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৪৭ ।
২৩। পত্রপুট, ১৫ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা - ১২৭-৩১ ।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। রবীন্দ্র-রচনাবলী (দ্বিতীয়, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও চতুর্দশ খন্ড), বিশ্বভারতী, পুনঃমুদ্রণ, পৌষ ১৪১৭ ।
২। ঘটক, কল্যাণীশঙ্কর, মানুষের ধর্ম ও রবীন্দ্রদর্শন, রত্নাবলী, কলাকাতা, ২০১৩ ।
৩। নিয়গী, গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ-১৪২০ ।
৪। পোদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মদ্রণ- ১৯৯৯ ।
৬। বন্দ্যোপাধায়, হিরন্ময়, উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশনী, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ ২৫শে জানুযারী, ১৯৯৫ ।